ফলে যে আনিয়ন্ত্রিত উপায়ে উদ্বেগ উস্কে দেওয়া হয় তা প্রশমিত হতে বহুবছর লেগে যাবে।......হয়তো পারস্পরিক আস্থা কোনোদিনই ফিরে আসবে না।

(চ) মহাবিদ্রোহের চরিত্র : ১৮৫৭ খ্রি.-এর মহাবিদ্রোহের চরিত্র নির্ধারণে প্রধান অন্তরায় সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব। বিদ্রোহী নেতা এবং বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত অপরাপর ব্যক্তিগণ কোনো রচনা, দলিল বা চিঠিপত্র রেখে যাননি যার ভিত্তিতে বস্তুনিষ্ঠ, নির্মোহ ইতিহাস রচনা সম্ভব। মহাবিদ্রোহের অব্যবহিত পরেও কোনো ভারতীয়ের পক্ষে নির্ভীক ও পক্ষপাতহীন ইতিহাস রচনা সম্ভব ছিল না। ফলে মহাবিদ্রোহের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের দলিলপত্র এবং ইংরেজ রাজপুরুষ, সেনাধ্যক্ষ ও ঐতিহাসিকদের রচনার ওপর নির্ভর করতে হয়। তবে সাম্প্রতিককালে গবেষণার ফলে মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে তৃণমূল স্তরে অনেক নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন লেখ্যাগারে সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজের ওপর ভিত্তি করে গবেষকগণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মহাবিদ্রোহকে বিচার করতে শুরু করেছেন। ফলে পুরানো ধ্যান-ধারণার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে মহাবিদ্রোহের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই উদ্যোগ নতুন মাত্রা পেয়েছে।

মহাবিদ্রোহের ইতিহাস রচনার অন্তরায়

ইংরেজ উপাদানের ওপর নির্ভরতা

তৃণমূল স্তরে গবেষণা শুরু

মহাবিদ্রোহের দেড়শো বছর

মহাবিদ্রোহের চরিত্র সম্পর্কে সমসাময়িক ব্রিটিশ লেখকগণ দু-ভাগে বিভক্ত ছিলেন। নর্টন Topics for Indian Statesman গ্রন্থে মহাবিদ্রোহকে 'গণবিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছেন। ডাফ, ম্যালেসন, কে, বল প্রমুখ লেখক এই মত সমর্থন করে বলেছেন ১৮৫৭ খ্রি.-এর অভ্যুত্থান ভারত থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নের একটি সুসংবদ্ধ প্রয়াস। চার্লস রাইক্স Notes on the Revolt in the North Western Province in India গ্রন্থে মহাবিদ্রোহকে প্রধানত একটি সিপাই বিদ্রোহ হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। সেনাধ্যক্ষ উট্রাম, টেলর প্রমুখ এই মতের সমর্থক। আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উগ্র সমর্থক স্যার জন লরেন্স মহাবিদ্রোহকে 'দেশদ্রোহী' ও 'স্বার্থপর' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে এর পেছনে কোনো সংগঠিত নেতৃত্ব ও জনসমর্থন ছিল না। রিজ এই বিদ্রোহকে ধর্মান্ধ হিন্দু-মুসলমানের খ্রিস্টধর্মবিরোধী জেহাদ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হোম্‌স এর মধ্যে 'সভ্যতা বনাম বর্বরতার' দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখেছেন।

নর্টন, ডাফ, ম্যালেসন, কে, বল—গণবিদ্রোহ

রাইক্স, উট্রাম, টেলর—সিপাই বিদ্রোহ

লরেন্স, রিজ, হোমস—বিদ্রোহের প্রতি ঘৃণা পোষণ

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল প্রায় সব সমসাময়িক ভারতীয় লেখকই রাইক্সের মতকে সমর্থন করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, কিশোরী চাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখার্জি, রাজনারায়ণ বসু, শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালির ব্রিটিশ অনুরাগ এর দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে। তা ছাড়া স্যার সৈয়দ আহমেদ খানও মহাবিদ্রোহকে নিছক সিপাই বিদ্রোহ বলেই মনে করতেন। এমনকি দাদাভাই নওরোজির মতো জাতীয়তাবাদী নেতাও মন্তব্য করেছেন, মহাবিদ্রোহে ভারতীয় জনসাধারণের কোনো অংশ তো ছিলই না বরং কর্তৃপক্ষের আহ্বানে তারা তাদের সমর্থন করতেও রাজি ছিল। কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও মহামেডান

সমসাময়িক ভারতীয় লেখকদের চোখে মহাবিদ্রোহ সিপাই বিদ্রোহ

সৈয়দ আহমেদ খান ও দাদাভাই নওরোজীর একই মত

Scanned with CamScanner

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ও মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন বিদ্রোহ বিরোধী

অ্যাসোসিয়েশন বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। লক্ষণীয় বিষয় হল ঊনবিংশ শতাব্দীর সমসাময়িক ভারতীয় লেখকগণই ১৮৫৭ খ্রি.-এর অভ্যুত্থানকে গণবিদ্রোহ আখ্যা দিতে রাজি হননি। অতএব মহাবিদ্রোহের চরিত্র সংক্রান্ত মতপার্থক্য কোনো জাতিগত রূপ নেয়নি।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ দ্বিমত

মহাবিদ্রোহের চরিত্রচিত্রণে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ একমত পোষণ করেন না। তাঁদের একাংশের মতে এটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। দীর্ঘদিন পূর্বে রজনীকান্ত গুপ্ত স্বীকার করেছেন যে সিপাইরা জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চেয়েছিল। সিপাই বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত গ্রন্থে বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকার মহাবিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ' আখ্যা দিয়েছেন। শশিভূষণ চৌধুরী মহাবিদ্রোহকে শুধু একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় যুদ্ধই নয়, একে গণবিদ্রোহরূপে বর্ণনা করেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসামরিক সাধারণ ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষ ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে অংশ নেয়। তিনি এই সংগ্রামী নেতাদের 'জাতীয়তাবাদের অচেতন যন্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত, সাভারকর, শশিভূষণ চৌধুরী— জাতীয়তাবাদী আদর্শ, ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ,

রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত-জাতীয় বা স্বাধীনতার যুদ্ধ নয়

অপরদিকে রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৮৫৭ খ্রি.-এর অভ্যুত্থানকে কোনো মতেই 'জাতীয়' বা 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' আখ্যা দিতে রাজি নন। এটি একটি সিপাই বিদ্রোহ ছিল মাত্র। একটি গণবিদ্রোহ বা স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সংগঠনের। ম্যালেসন এরকম কিছু ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করলেও অন্য কোনো সূত্রে তা সমর্থিত হয় না। রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন, অভ্যুত্থান প্রধানত বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল এই অভ্যুত্থানে সাড়া দেয়নি। অতএব একে জাতীয় চরিত্রে ভূষিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। *দ্বিতীয়ত*, যে-কোনো ব্রিটিশবিরোধী যুদ্ধকেই স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা যায় না। কি উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে ও কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে দেখা হচ্ছে সেটাই বিচার্য বিষয়। তাঁর মতে বিদ্রোহের নেতারা বিদেশি শাসনের অবসানকল্পে কোনো দেশপ্রেমিক সংকল্প নিয়ে এই অভ্যুত্থান ঘটায়নি। অনেক দেশীয় রাজন্য রাজ্য হস্তচ্যুত হওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিলেন; অনেক জমিদার-তালুকদার জমিদারি হস্তচ্যুত হওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিলেন; অনেক রাজন্য তাঁদের দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকার নাকচ হওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিলেন; কোনো কোনো রাজন্য ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হন। এঁরা সকলেই বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অতএব সকলেই সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। *তৃতীয়ত*, মহাবিদ্রোহকে স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্যাদা দিলে তার পূর্বে সংঘটিত পিন্ডারি এবং ওয়াহাবি আন্দোলনসহ কৃষক, উপজাতি ও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনগুলিকেও একই মর্যাদায় ভূষিত করা উচিত। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে মহাবিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ আখ্যা দেওয়ার মধ্যে আবেগপ্রবণতাই বেশি, বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসবোধ কম। কারণ ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী চেতনা তখনো ভ্রূণ অবস্থায় ছিল।

ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ

উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বিবেচ্য

বিদ্রোহী নেতাগণ ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত

মহাবিদ্রোহ স্বাধীনতার যুদ্ধ হলে পূর্ববর্তী বিদ্রোহগুলির একই মর্যাদা পাওয়া উচিত

জাতীয়তাবাদী চেতনা ভ্রূণ অবস্থায়

'1857' শীর্ষক গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাবিদ্রোহকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম হিসাবে মেনে নেননি। সিপাইদের অভ্যুত্থানের সুযোগে একদল হতাশ সামন্তপ্রভু ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে ব্রিটিশ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। জাতীয় স্তরে কোনো নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা ছিল না। অভ্যুত্থানগুলি ঘটেছিল বিক্ষিপ্তভাবে। তবে সুরেন্দ্রনাথ সেন স্বীকার করেছেন অন্তত অযোধ্যায় এই বিদ্রোহ জাতীয় চরিত্র নিয়েছিল যদি 'জাতীয়' শব্দটিকে আমরা সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করি। তিনি লিখেছেন, ধর্মের জন্য যুদ্ধ হিসাবে যার সূচনা তার পরিণতি

সুরেন্দ্রনাথ সেনের অভিমত

সামন্ত বিদ্রোহ

Scanned with CamScanner

স্বাধীনতার যুদ্ধে। কারণ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে অযোধ্যার বিদ্রোহীরা বিদেশি সরকারের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিল ও পুরানো ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল যার আইনসংগত প্রতিনিধি অযোধ্যার নবাব।

অযোধ্যায় জাতীয় বিদ্রোহের চরিত্র

মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চাতেও মহাবিদ্রোহের চরিত্র নির্ধারণে ঐকমত্য লক্ষ করা যায় না। স্বয়ং কার্ল মার্কস একে সেনাবিদ্রোহ না বলে জাতীয় বিদ্রোহ আখ্যা দেন। ভারতে মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের অন্যতম পুরোধা মানবেন্দ্রনাথ রায় ও রজনীপাম দত্ত এই বিদ্রোহকে ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ সামন্তপ্রভুদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার শেষ প্রতিক্রিয়াশীল প্রয়াস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ. আর দেশাইও মনে করেন অভ্যুত্থানটি বিদেশিবিরোধী যার মধ্যে কোনো ইতিবাচক জাতীয়তাবাদী মনোভাব ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকগণ এই অভ্যুত্থানকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণবিদ্রোহ রূপে চিত্রিত করেছেন। প্রমোদ সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন, লখনউ, অযোধ্যা, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। কোনো কোনো অঞ্চলে বিদ্রোহীরা সুপরিকল্পিতভাবে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল নেয়। প্রমোদ সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক জমিদার, মহাজন, বানিয়ারাও বিদ্রোহীদের আক্রমণের শিকার হয়। সুপ্রকাশ রায় মনে করেন, বিদ্রোহী সিপাইদের কৃষি বা অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত অথবা পেশাচ্যুত আত্মীয়স্বজন স্থানীয় জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধেও আক্রমণ চালায়। অনেক ক্ষমতাচ্যুত সামন্তপ্রভু বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। সুশোভন চন্দ্র সরকার মহাবিদ্রোহের সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের কথা স্বীকার করে নিলেও একে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিতে নারাজ। তাঁর মতে বিদ্রোহ সফল হলে ভারতে নতুন শক্তি ও চিন্তার উন্মেষ ঘটত। তা ছাড়া কোনো সংগঠন ছাড়াই যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ ঘটে থাকে তবে সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রশ্ন ওঠা উচিত নয় বলে তিনি মনে করেন।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা দ্বিমত

কার্ল মার্কস

মানবেন্দ্রনাথ রায়

রজনীপাম দত্ত, এ আর দেশাই

প্রমোদ সেনগুপ্ত

সুপ্রকাশ রায়

সুশোভন চন্দ্র সরকার

এরিখ স্টোক্স মহাবিদ্রোহে জনসাধারণের অংশগ্রহণের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে গ্রামীণ ভূস্বামী ও সামন্তপ্রভু এই বিদ্রোহে অংশ নেয় ও তাদের অনুসরণ করে তাদেরই অনুগামীগণ। অপরদিকে খ্রিস্টোফার বেইলি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে মহাবিদ্রোহের চরিত্র আলোচনা করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন গোড়া থেকেই অসামরিক মানুষের বিদ্রোহ ও সিপাইদের অভ্যুত্থান একে অপরকে শক্তিশালী করেছিল। তবে বেইলি স্বীকার করেছেন বিদ্রোহীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য কোনো সুসংবদ্ধ মতাদর্শ বা কর্মসূচি ছিল না। প্রথম থেকেই পুরানো ব্যবস্থার প্রতিনিধিদের প্রাধান্য ছিল বেশি। বিদ্রোহের ভিত্তি জাতীয়বাদ ছিল না। কারণ ভারতীয় সমাজের প্রান্তিক অথবা অবক্ষয়প্রাপ্ত অঞ্চল থেকেই সাধারণভাবে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ এসেছিল।

এরিখ স্টোক্স

খ্রিস্টোফার বেইলি

অসামরিক ও সিপাই বিদ্রোহ একে অপরের পরিপূরক

টমাস মেটকাফ মহাবিদ্রোহের চরিত্র সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, একটি মতৈক্য আছে যে এই বিদ্রোহ কখনো-কখনো সিপাই বিদ্রোহকে ছাপিয়ে গেছে, কিন্তু কখনোই জাতীয় বিদ্রোহের পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন এই মতৈক্যের বিষয়ে কোনো কোনো ঐতিহাসিক সাম্প্রতিককালে প্রশ্ন তুলেছেন। ১৮৫৭ খ্রি.-এ বিদ্রোহীদের মধ্যে আধুনিক অর্থে ভারতীয় জাতির ধারণা ছিল না। কৃষকের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে। কিন্তু পূর্ববর্তী কৃষকবিদ্রোহগুলি থেকে মহাবিদ্রোহ ছিল কিছুটা স্বতন্ত্র। বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় ছিল। নানারকম গুজব তাদের এক অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধে রাখে। বিদ্রোহীদের অপর বন্ধন হল ব্রিটিশ রাষ্ট্রের প্রতি বিতৃষ্ণা। কারণ এই রাষ্ট্রই তাদের জীবনে

মহাবিদ্রোহ সম্পর্কিত আধুনিক ইতিহাসচর্চা

টমাস মেটকাফের অভিমত

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় জাতির ধারণা ছিল না

Scanned with CamScanner

ব্রিটিশদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও নানান গুজব অদৃশ্য বন্ধন গড়ে তোলে

তাপ্তী রায়—ধর্ম ও বর্ণ আক্রান্ত

গৌতম ভদ্র

রণজিৎ গুহ—

শাসনক্ষেত্রের প্রকৃতি

ভৌগোলিক বা সামাজিক অর্থ

রজতকান্ত রায়—ধর্মীয় মিল

মোগল বাদশাহ রাজনৈতিক বৈধতার উৎস

খ্রিস্টোফার বেইলি-শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য

বিদ্রোহ সামন্তপ্রভু পরিচালিত

এরিখ স্টোক্স ও জুডিথ ব্রাউন

রুদ্রাংশু মুখার্জি ও রজতকান্ত রায়

বাহাদুর শাহ, নানা-সাহেব, লক্ষ্মীবাই সিপাইদের চাপে বিদ্রোহে যোগদান

বিপর্যয় ডেকে এনেছে। অতএব ব্রিটিশদের সমর্থনকারী যে-কোনো কর্তৃত্বকেই তারা আঘাত হানতে তৈরি ছিল। তাপ্তী রায় মনে করেন বিদ্রোহীরা বিশ্বাস করত বিদেশি শক্তির অনুপ্রবেশ ও শাসনের ফলে তাদের ধর্ম ও বর্ণ আক্রান্ত। গৌতম ভদ্র লিখেছেন, পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রে বিদেশি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সম্বন্ধে যে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও বোধ জন্মাত তার দ্বারাই বিদ্রোহীদের বিদ্রোহাত্মক কাজ পরিচালিত হত। যদিও বিদ্রোহীরা একে অপরের অপরিচিত ছিল, হয়তো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল তবুও এক বিশেষ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে তারা একই শত্রুর মোকাবিলায় নেমেছিল। রনজিৎ গুহ লিখেছেন, তারা অস্ত্র ধারণ করেছিল, যাকে তারা পূর্বপুরুষের শাসনক্ষেত্র বলে বিশ্বাস করত, তাকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে।

কার্যক্ষেত্রে সেই শাসনক্ষেত্রের প্রকৃতি বিদ্রোহীদের কাছে কী ছিল তা নিয়ে বিভ্রান্তি থাকতে পারে। ভৌগোলিক বা সামাজিক অর্থে সেই শাসনক্ষেত্রের ধারণা হয়তো গ্রামের চেয়ে বা তাদের জাতি বা জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে বড়ো ছিল। রজতকান্ত রায় দেখিয়েছেন বিদ্রোহীরা 'হিন্দুস্তানকে' বিদেশি শাসনমুক্ত করতে চেয়েছিল। সবাই মনে করত হিন্দুস্থান হিন্দু ও মুসলমান, সমানভাবে সবার জন্য। বিদ্রোহ চলাকালীন ধর্মীয় মিল ছিল চোখে পড়ার মতো। বিদ্রোহীরা পুরানো ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যবস্থা সপ্তদশ শতাব্দীর কেন্দ্রীভূত মোগল সাম্রাজ্য নয়, তা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক বিন্যাস। সেক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসকরা অনেক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করত। কিন্তু সকলেই তাদের রাজনৈতিক বৈধতার উৎস হিসাবে মোগল বাদশাহকেই স্বীকার করে নিত। খ্রিস্টোফার বেইলি মন্তব্য করেছেন, বিদ্রোহীদের দাবি ছিল মোগল বৈধতার পরিমণ্ডলে ইন্দো-মোগল স্বদেশি রাষ্ট্রগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যেখানে জমি ও জনগণের মাঝে থাকবে সুস্থ সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক। এমনকি কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের আনুগত্যের মধ্যেও উভয়সংকট দেখা দেয়। তাদেরও কিছু অভিযোগ ছিল যা ব্রিটিশ শাসনের অধীনতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই প্রেক্ষিতেই শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ১৮৫৭-৫৮ খ্রি.-এ ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে আপত্তি ও অসন্তোষের স্বর শোনা গিয়েছিল, যদিও তা উদাত্ত মুক্তির আহ্বান ছিল না।

মহাবিদ্রোহের চরিত্র সংক্রান্ত বিতর্কের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটি শুধু উচ্চকোটির মানুষের বিদ্রোহ কি না। এরিখ স্টোক্স ও জুডিথ ব্রাউন মনে করেন এটি ছিল সামন্তপ্রভুর মতো উচ্চকোটির মানুষের পরিচালিত। তারাই বিদ্রোহকে একটি সাধারণ রূপ দিতে পারত। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে সামন্তপ্রভুরা অনেক ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিতে অনিচ্ছুক ছিল। রুদ্রাংশু মুখার্জি ও রজতকান্ত রায়ের গবেষণা থেকে জানা যায় বাহাদুর শাহ অনেক ইতস্তত করার পর সিপাইদের চাপে নেতৃত্ব দিতে রাজি হন। সিপাইরা নানাসাহেব ও লক্ষ্মীবাইকে কার্যত মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে বিদ্রোহের পথে ঠেলে দেয়। অযোধ্যার দৃষ্টান্তে রুদ্রাংশু মুখার্জি দেখিয়েছেন যে সেখানকার তালুকদারদের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক নির্ভরতার। এক এক অঞ্চলে তালুকদারদের ভূমিকা ছিল এক এক রকম। অযোধ্যার তালুকদারদের কেউ কেউ ব্রিটিশের প্রতি অনুগত থাকে, আবার অনেকে বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেয়। কেউ কেউ বিদ্রোহে অংশ নিলেও ব্রিটিশবাহিনীর সামনে সহজেই আত্মসমর্পণ করে। অনেক স্থানে বিদ্রোহের উদ্যোগ সামন্তশ্রেণির কাছ থেকে আসেনি, এসেছিল অন্য শ্রেণির কাছ থেকে। অনেক ক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

কৃষক ও হস্তশিল্পীদের চাপে তালুকদার বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তালুকদাররা ব্রিটিশের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করে নিলেও জনসাধারণ বিদ্রোহ চালিয়ে গেছে। এক ধরনের ইতিহাসচর্চায় মহাবিদ্রোহে সামন্তপ্রভুদের বিদ্রোহী চেতনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেন কৃষক-প্রজাদের কোনো চেতনা নেই। তারা শুধু প্রভুদের অনুগামী হয়েছে। রুদ্রাংশু মুখার্জির গবেষণায় pressure from below বা নীচুতলার চাপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চাপের মুখে তালুকদারদের বিদ্রোহে যোগদান

সামন্তপ্রভুর পাশাপাশি কৃষক-প্রজারও চেতনা সক্রিয় ছিল

এ প্রসঙ্গে অপর একটি বিতর্কের অবতারণা করা যেতে পারে। একটি সাম্প্রতিক গ্রন্থে* প্রকাশিত কিছু নিবন্ধে বিদ্রোহে সিপাইদের কোন্ পরিচয়টি প্রাধান্য পেয়েছে, সৈনিক নাকি কৃষক, এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ সামরিক অফিসার ও ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের পাশাপাশি কৌশিক রায়, সল ডেভিড ও সব্যসাচী দাশগুপ্তের মতো কিছু আধুনিক গবেষক মনে করেন সিপাই ও সওয়াররা ব্রিটিশ-ভারতীয়বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল শুধু নিয়মিত বেতন ও অবসরকালীন ভাতার আশায়। সিপাইরা ভাড়াটে সেনার বেশি কিছু ছিল না। সামরিক বিভাগের কাঠামোর মধ্যেই সিপাইরা তাদের চাকরির উন্নততর শর্তাবলি দাবি করেছিল। ঊর্ধ্বতন অফিসারদের মতো তারাও কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে। রায়-দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন, সামরিক কর্তৃপক্ষ যখন সেনাঅফিসারদের কাছ থেকে সিপাইদের ওপর চরম শাস্তি দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেয় তখন সিপাইরা তাদের অফিসারদের চ্যালেঞ্জ করতে অনুপ্রাণিত হয়। রুদ্রাংশু মুখার্জি অপরদিকে সিপাইদের বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের পৃষ্ঠপটে বিচার করেছেন। ১৮৫৭ খ্রি.-এর অভ্যুত্থানকে একটি বড়ো আকারের কৃষক বিদ্রোহ বলে মনে করা হয়। রুদ্রাংশু মুখার্জির মতে সিপাইদের 'বিদ্রোহী চেতনার' সঙ্গে 'কৃষক মানসিকতার' অনেক মিল আছে। বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোগটি এসেছিল সিপাইদের দিক থেকে যারা ছিল আদতে 'উর্দিপরা কৃষক'। অভ্যুত্থানের সময় তারা উর্দি ছেড়ে কৃষকদের সঙ্গেই মিশে যায়। উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে সেনাছাঁউনিতে অভ্যুত্থানের প্রভাব পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে পৌঁছে যেত। সিপাইদের বর্ণগত বন্ধনও কৃষকদের সঙ্গে একটি মেলবন্ধন গড়তে তুলতে সাহায্য করে। সিপাই-কৃষক চেতনার এই সমন্বয়কে রুদ্রাংশু মুখার্জি 'জাতীয়তাবাদ-পূর্ব দেশপ্রেম' আখ্যা দিয়েছেন।

সিপাইদের পরিচিতি—সৈনিক না কৃষক

কৌশিক রায়, সল ডেভিড, সব্যসাচী দাশগুপ্ত—সিপাইদের দাবি ছিল উন্নততর চাকরির শর্তাবলি

রুদ্রাংশু মুখার্জি

সিপাইদের বিদ্রোহী চেতনার সঙ্গে কৃষক মানসিকতার মিল

সিপাই-কৃষক মেলবন্ধন

১৮৫৭ খ্রি.-এর মহাবিদ্রোহে চরিত্র সংক্রান্ত ওপরের আলোচনা থেকে দুটি প্রশ্ন উঠে আসে। একটি, এই অভ্যুত্থান গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল কি না; অপরটি, এই অভ্যুত্থানকে জাতীয় সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া সংগত কি না। এ দুটি প্রশ্নে ঐতিহাসিকদের বিতর্ক দীর্ঘদিনের। সমকালীন ব্রিটিশ অভিমত দ্বিধাবিভক্ত, ভারতীয় অভিমতে ব্রিটিশ আনুগত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। রজনীকান্ত গুপ্ত, বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও শশিভূষণ চৌধুরী মহাবিদ্রোহের জাতীয় ও গণমুখী চরিত্রের ওপর জোর দিলেও রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ সেন এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালের মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চায় এই দ্বিতীয় অভিমত অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁরা মহাবিদ্রোহের গণমুখী চরিত্রের গুরুত্ব দিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে নব্য কেমব্রিজ ঐতিহাসিকগণ মহাবিদ্রোহে সামন্তপ্রভু তথা পুরানো ব্যবস্থার প্রতিনিধিদের প্রাধান্য খুঁজে পেলেও এর

গণবিদ্রোহ ও জাতীয় সংগ্রাম

জাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী বিতর্ক

নব্য কেমব্রিজ অভিমত

সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা

* War and society in colonial India. Edited by Kaushik Roy, Oxford University Press, 2006. Reveiw Article by Sushil Chaudhury, 8th Day. The Sunday Statesman Magazine, April 1.2007.

Scanned with CamScanner

মহাবিদ্রোহ সংক্রান্ত ইতিহাসচর্চার পরিবর্তনশীল ধারা

গণমুখী চরিত্রকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু তাঁরা একে জাতীয় চরিত্রে ভূষিত করতে নারাজ। দেশীয় রাজন্যবর্গ ও সামন্তপ্রভুদের মনোভাব ও ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সাম্প্রতিককালে কিছু ঐতিহাসিকের গবেষণায় উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মহাবিদ্রোহ কিভাবে একটি সার্বিক গণবিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে তার চিত্র ফুটে উঠেছে। গত দেড় শতাব্দীকাল ধরে ১৮৫৭ খ্রি.-এর অভ্যুত্থানের চরিত্র নির্ধারণের ইতিহাসচর্চার পরিবর্তনশীল ধারাটি লক্ষণীয়।

জাতীয় স্তরে নয়, উত্তর ভারতের কোনো কোনো স্থানে গণ অভ্যুত্থানের চরিত্র

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে ১৮৫৭ খ্রি.-এর মহাবিদ্রোহ সর্বভারতীয় জাতীয় চরিত্র অর্জন করতে না পারলেও বিচ্ছিন্নভাবে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তা গণ অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ১৮৫৭ খ্রি.-এর পূর্বেও সিপাই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকা ছিল না। অপরদিকে কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহগুলিতেও অন্যান্য সামাজিক শ্রেণির মানুষ ও সিপাইরা অংশ নেয়নি। কিন্তু মহাবিদ্রোহে আঞ্চলিক ভিত্তিতে হলেও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন স্বার্থে ব্রিটিশ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। ফলে সিপাই বিদ্রোহ ও গণবিদ্রোহ একে অপরকে শক্তিশালী করে ও একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। আধুনিক অর্থে মহাবিদ্রোহ জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ছিল না। কারণ তখন জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটেনি। তা ছাড়া বিদ্রোহ উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বলা যেতে পারে মহাবিদ্রোহ সিপাই বিদ্রোহকে ছাড়িয়ে অনেক পথ অগ্রসর হয়েছে কিন্তু কখনো তা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে মহাবিদ্রোহ ছিল জাতীয়তাবাদপূর্ব দেশপ্রেমের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি।*

সিপাই ও গণবিদ্রোহ পরস্পরকে শক্তিশালী করেছে

জাতীয়তাবাদ-পূর্ব দেশপ্রেম

Scanned with CamScanner